# ইয়াংগুন থেকে বাগো

## শোভন শামস

শোয়েনডাগন প্যাগোডা, ইয়াংগুন

বাংলাদেশ বিমানে করে ইয়াংগুনে যখন ল্যান্ড করলাম তখন সেখানে দুপুর বেলা । খুব সাদামাটা এয়ারপোর্ট। কোন বোডিং ব্রিজ নেই । সিড়ি দিয়েই বিমান থেকে নামলাম । ফর্মালিটিজ বেশ দ্রুতই শেষ হলো। বাংলাদেশ থেকেও ভিসা পেতে তেমন সমস্যা হয়নি । সরকারী সফর বলে সবকিছু সুন্দর ভাবে সম্পন্ন হয়েছে। বিমান বন্দর থেকে এসি বাসে করে আমাদের গন্তব্য রাজধানী ইয়াংগুন শহরের মিকাসা হোটেলে এসে পৌছালাম। বিশাল হোটেল চার কি পাঁচ তারকা সবকিছু ঝকঝকে তকতকে। হোটেল দেখেই মিয়ানমার সম্বন্ধে আমাদের ধারনা কিছুটা হলেও ধাক্কা খেল। সব সময় শুনতাম এদেশ মিলিটারীরা শাসন করছে। দেশের কোন উন্নতি নাই । আন্তর্জাতিক চাপে সব উন্নয়ন কার্যক্রম বন্ধ । সবকিছু যে একদম সত্যি নয় তা না, তবে জীবন ঠিকই চলছে বিভিন্ন সমস্যা সংগে নিয়ে এবং দেশটা বেশ উন্নত ও সুন্দর । সাউথ ইষ্ট এশিয়ার মধ্যে মিয়ানমার সবচেয়ে বড় দেশ, অবশ্য ভূমির দিক থেকে । এটা উত্তর দক্ষিণে ২০৯০ কিঃ মিঃ এবং পূর্ব পশ্চিমে সবচেয়ে প্রশস্ত এলাকায় ৯২৫ কিঃ মিঃ । সর্বমোট আয়তন প্রায় ৬ লক্ষ ৭৭ হাজার বর্গ কিলোমিটার । বাংলাদেশের

প্রায় পাঁচগুণ বলা চলে । তবে এর ৫১ ভাগ পাহাড় ও দূর্গম অরণ্য । জনসংখ্যা বাংলাদেশের এক তৃতীয়াংশের মত । এই বিশাল দেশ তাই ফাঁকা ফাঁকা লাগে । রাস্তা ঘাট বেশ চওড়া এবং ফাঁকা । যানবাহন ও লোকজন এর তেমন কোন ভীড়ই নেই বলা চলে । মিকাসা হোটেলের ৪ তলায় সুন্দর একটা রুম পেলাম । বিশাল জানালা দিয়ে নীচের সুইমিং পুল দেখা যায় । টিভি আছে কয়েকটা চ্যানেল ও দেখা যায় । রান্নার জন্য সব ব্যবস্থা আছে, টয়লেট ও তকতকে । সব মিলিয়ে আরামদায়ক আলোকিত ও অত্যাধুনিক । নীচের রিসিপশন এর কাজকর্ম শেষে রুম সার্ভিস আমাদের রুমে পৌছে দিল । কিছুক্ষণ ফ্রি টাইম শেষে বিকেল বেলা আমরা ডিফেন্স সার্ভিস হিষ্টোরিক মিউজিয়াম দেখতে যাব ।

তিনটার দিকে বাসে করে রওয়ানা হলাম । শহরের মধ্যেই মিউজিয়াম । যে সব সমরাস্ত্র মিয়ানমারে আছে এবং ছিল সেগুলো, এবং যা এখন তারা তৈরী করছে সবগুলোর ডিসপ্লে আছে এই বিশাল মিউজিয়ামে । মিউজিয়ামটা বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা কোথাও কামান এর সারি, কোথাও ট্যাংক, অন্যান্য অস্ত্রসস্ত্র, বিমান, পোষাক পরিচ্ছদ ইত্যাদি আলাদা আলাদা ভাবে সাজানো আছে । লিফ্ট এ উঠে গ্যালারীতে এসে নীচের ডিসপ্লে দেখা যায় । কর্তৃপক্ষ প্রথমে আমাদেরকে মিউজিয়াম সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারনা দিল, তারপর বিভিন্ন সেকশন দেখতে বের হলাম । এখানে চীনের প্রযুক্তির পাশাপাশি ফেঞ্চ, ব্রিটিশ, ইসরাইলি ইত্যাদি প্রযুক্তির যন্ত্রপাতি ও অনেক আছে । পুরো মিউজিয়াম ঘুরে দেখতে অনেক সময় লাগে । এখানে প্রাচীন যুদ্ধের ইতিহাসগুলো সুন্দর ভাবে মডেল এর সাহায্যে বর্ণনা করা। আছে আমরা প্রায় ২ ঘন্টার মত ঘুরে ঘুরে মিউজিয়ামের বিভিন্ন জিনিষপত্র দেখলাম । তারপর হোটেলের পথে ফেরত, রাতে খাওয়া নিজেদের তাই দেশী খাওয়া কোথায় পাওয়া যাবে হোটেলের রিসিপশনে জানতে চাইলাম । জানাল যে শহরে অনেক দোকান আছে সেখানে আমাদের দেশী খাবার পাওয়া যাবে ।

সিটি সেন্টার , ইয়াংগুন

আমরা শহরে যাওয়ার জন্য রেডি হলাম। বাসে করে সিটি সেন্টারে নিয়ে আসল ও সময় দিয়ে দিল । ঘুরে ফিরে যেন আমরা আবার বাসে করেই ফেরত আসতে পারি। সন্ধ্যা হয় হয় । আশপাশের এলাকা দেখে রওয়ানা হলাম । বাজার এলাকা, শহরে অনেক মানুষ সবাই শান্ত কেমন যেন চাপা ভাব সবার মাঝে। আমাদের দেখে খুশীই মনে হয় সাধারন লোকজন । অল্প ইংরেজী বুঝে । আমাদেরকে হোটেল দেখিয়ে দিল । সেখানে গিয়ে হতবাক । মালিক চট্টগ্রামের অধিবাসী ছিল এখন রেংগুনে স্থায়ী । অনেক বছর হোটেল ব্যবসা করছে । বেশ চালু হোটেল প্রচন্ড ভীড় । মেইন মেনু বিরিয়ানী, আমাদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা করে দিল । গরম পানি দিয়ে প্লেট ধুয়ে খেতে দিল। এখানে আসার আগে মানি চেঞ্জারে ডলার চেঞ্জ করে নিলাম আমাদের টাকার মান এখানে বেশী, এদের মুদ্রার নাম কিয়েত/চ্যাট বলে। হোটেলে বিরানী কোক ইত্যাদি খেলাম অল্প খরচ ১০০ টাকার মধ্যে ভাল করে তৃপ্তি সহকারে খেলাম। আমরা বললাম আগামী কদিন ও এখানে এসে খাব । কোন সমস্যা নেই বলল মালিক। ভালই লাগল ভিন দেশে স্বদেশী দেখে। আশে পাশের দোকান পাট ঘুরে দেখলাম। কেনার মত তেমন কিছুই নেই। বার্মিজ স্যুভেনির কিনলাম কয়েকটা। ওদের ট্রাডিশনাল বাদ্য যন্ত্র । একটা জাহাজের কাঠের মডেল ও কিছু ওয়াল ম্যাট কেনা হলো, মায়ানমারের ম্যাপ আঁকা ও বিভিন্ন জাতি গোষ্টির ছবি সহ। এখানে তেতুল এর রস এর ডিংকস পাওয়া যায় । ১০ টাকার মত দাম বেশ মজার। সময় মত বাসের লোকেশনে এলাম এবং হোটেলে ফিরে এলাম ।

পরদিন বিকেল বেলা আমরা ইন্টারন্যাশনাল থেরা ভাদা বুদ্ধিষ্ট মিশনারী বিশ্ব বিদ্যালয়ের সামনে আসি। সুন্দর করে সাজানো এলাকা। সোনালী গম্বুজগুলোর উপর আলো পড়ে অপূর্ব দৃশ্য সৃষ্টি

হয়েছে। সবগুলো বিল্ডিং এর ছাদ ও গম্বুজ ঐতিহ্যবাহী নকসা করা ও সোনালী রং এ রাঙানো। এখানে বৌদ্ধ ধর্মের উপর অগাধ পান্ডিত্যপূর্ণ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ভিক্ষুরা শিক্ষা প্রদান করে থাকেন । প্রথমে আমরা জুতা খুলে একটা প্রার্থনা সভায় যোগ দিলাম । আমাদেরকে সেখানে বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে ধারনা দেয়া হলো ও কি কি জিনিষ দেখার আছে তা বলা হলো। এই বিশ্ববিদ্যালয়টি নয় ডিসেম্বর ১৯৯৮ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে । এটা থেরা ভেদা বুদ্ধিজম সম্পর্কীত উচ্চতর জ্ঞানের স্থায়ী কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠেছে । এটা ইয়াংগুনের টুথ রিলিক প্যাগোডার কাছে ধমপালা পাহাড়ের নিকটে একটা সুন্দর ও পবিত্র পরিবেশে নির্মিত হয়েছে । প্রায় এক হাজার বছর ধরে মিয়ানমার থেরা ভেদা বুদ্ধিজমকে সযত্নে সংরক্ষণ করে আসছে । এই ইজমের মূল মন্ত্র হলো বুদ্ধের বানীকে প্রায়োগিক ও তাত্ত্বিক ভাবে ব্যবহার করে পৃথিবীতে সুখ ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধিতে অবদান রাখা । যারা মিয়ানমারের ট্রাডিশান মেনে বুদ্ধ ধর্মের উপর বুৎপতি লাভ করতে চায় তারা এই বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর জ্ঞান আহরণ করতে পারে এবং এই জ্ঞান বিতরনের জন্য পালি কানুন সম্বন্ধে অভিজ্ঞ বৌদ্ধ পন্ডিত এখানে পরিশ্রম করছে । বিদেশীদের জন্য বৌদ্ধ ধর্মের জ্ঞানের পাশাপাশি ভাষা শিখারও ব্যবস্থা রয়েছে, পড়ার মাধ্যম ইংরেজী । এখানে বৌদ্ধ ধর্মের উপর ডিপ্লোমা, ব্যাচেলর ডিগ্রী, মাষ্টার্স ও পিএইচডি পর্যন্ত করা যায়। এখানে ভিক্ষু ও মহিলা ভিক্ষুদের (নান) ও শিক্ষার ব্যবস্থা আছে । বিশ্ব বিদ্যালয়টি আবাসিক ও চমৎকার থাকার কক্ষ রয়েছে । মহাস্থান গড়ে যেমন ছোট ছোট কক্ষ আছে এখানেও সে মাপের কক্ষে ভিক্ষুরা বসবাস করে পড়াশোনা চালিয়ে যায় । ঘুরে ঘুরে সব এলাকা দেখলাম। শেষে চা পর্ব ছিল। বেশ আন্তরিক ছিল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ । এরপর আমরা ইয়াংগুনের উপকণ্ঠে ভারতের শেষ মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফর এর মাজার যিয়ারত করতে গেলাম।

সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফর এর মাজার , ইয়াংগুন

কোথায় দিল্লী আর কোথায় তখনকার অখ্যাত বার্মা মুলুকের রাজধানীর এক কোনে কোন মতে টিকে আছে এক সম্রাটের সমাধি । সমাধিস্থান সবাই চেনে তবে এলাকাটা অনুন্নত ও অনগ্রসর । মুসলিম প্রধান এলাকা তাই বৌদ্ধ প্রধান মিয়ানমারে এরা অবহেলিত । প্যাগোডার চাকচিক্য এখানে নেই । তবে তাঁর সাথে আসা লোকজনের বংশধররা তাদের সম্রাটের সমাধিকে যতটা সম্ভব সম্মানের সাথে আগলে রাখার চেষ্টা করছে । সিড়ি দিয়ে উপরে উঠতে হয় । সমাধির পার্শ্বে একটা সমজিদ আছে । অভ্যাগতদের বসার বাবস্থা আছে। কবর সবুজ রঙ এর গিলাফ দিয়ে ঢাকা । খাদেম আছে তাঁরা এটার পরিচর্যা করে । পর্যটকরা মাঝে মাঝে আসে কিছু দান করে যায় । স্থানীয় ভাবে এরাও কিছু সংগ্রহ করে তার পরিচর্যা করে । কবর যেয়ারত শেষে আমাদের চা চক্রে আমন্ত্রণ জানালো । একেত তারা নিজেরাই সমস্যায় আছে তাই তাদের সমস্যা বাড়াতে চাইনি । তবে জোর করে জিলাপী ও চা খাওয়ালো । মনে মনে ভাবছিলাম কোথায় শৌর্য বীর্য আর কোথায় এই হত দরিদ্র অবস্থান । আল্লাহ চাইলে বাদশাহ ফকির হতে কতক্ষণ । এত শান শওকত পূর্ণ বাদশাহকে সংগ দেয়ার জন্য হাতে গোনা কয়েকজন সাথী শুধু ছিল । মনটা ভারাক্রান্ত হলো মানুষের এই পরিনতি দেখে ।

মিয়ানমার এর খনিজ সম্পদ অফুরন্ত । এর মধ্যে মূল্যবান পাথরের খনিগুলো অন্যতম । এখানে হীরা, চুনি, পান্না, নীলা এ সব বিখ্যাত পাথরের খনি আছে । প্রকৃতি অকৃপন হাতে এদেশের মাটির নীচে খনিজ সম্পদ দিয়ে দিয়েছে । মিয়ানমারের জেমস মিউজিয়াম বিশাল মিউজিয়াম, নিরাপত্তা ব্যবস্থাও বেশ উন্নত । মিউজিয়ামের ভিতর অনেক পাথর ডিসপ্লেতে আছে তাই সেগুলোকে সংরক্ষণ ও নিরাপদে রাখা নিশ্চিত করতে হয় । মিয়ানমারে কি কি মূল্যবান পাথর এর খনি আছে সে সম্বন্ধে মিউজিয়ামের ইনচার্জ আমাদের ব্রিফ করলো । বিশাল একটা রুমে মিয়ানমার এর ভূ-প্রাকৃতিক ম্যাপ কাঁচের ক্যাসকেডে রাখা । সেখানে বিভিন্ন রকমের সুইচ আছে । ডায়মন্ড বা হীরার খনি দেখতে চাইলে একটা সুইচ জ্বালালে ম্যাপের মডেলে সে সব খনি এলাকা ও খনিজ সম্পদে ভরা এলাকায় লাইট জ্বলে উঠে । এভাবে বিভিন্ন ধরনের মূল্যবান পাথরের খনি বিভিন্ন রং এর লাইট দিয়ে নির্দেশ করা আছে । এরপর সেই সব পাথর একে একে বিভিন্ন জায়গায় রাখা আছে । খনিতে পাথরগুলো দেখতে কি রকম লাগে তা দেখলাম । সাধারন পাথরের মত, কিছুটা রং এর তারতম্য দেখা যায় । পাথর এর চেহারা আসলে এর কাটিং এর পরেই ফুটে উঠে ধাপে ধাপে । খনির পাথর কেটে একেকটাকে একেক রকম আকার দেয়া হয় এবং তারপর এর দ্যুতি বেরিয়ে আসে । এমারেল্ড, জেড

স্যাফায়ার, ডায়মন্ড, ক্যাটস্আই, রুবী ইত্যাদি মূল্যবান ও সাধারন অলংকারের পাথরগুলো আহরন ও ফিনিশ প্রোডাক্ট দেখানো হয়েছে । এটা সরকার পরিচালিত এবং এখান থেকে খাঁটি পাথর কেনা যায়। কিনতে চাইলে নির্দিষ্ট দামে পাথর কেনারও ব্যবস্থা আছে এখানে । বাইরের দোকানে আরো কম পলিশ করা পাথর একটু সস্তায় পাওয়া যায় তবে সে সব দোকানে নকল পাথরকে আসল বলে চালাতে পারে বিধায় পাথর না চিনলে না কেনাই ভাল । আমরা মূল্যবান পাথর কিনিনি । তবে প্রথম বারের মত এই সব খনি ও খনি থেকে উত্তোলিত পাথর দেখে বেশ আনন্দ বোধ করলাম । প্রায় ঘন্টা খানেকের বেশী লেগে গেল সব কিছু ঘুরে দেখতে । অনেক দর্শকের সমাগম হয় এসব মিউজিয়ামে । পাথর প্রেমিকদের জন্য এটা একটা খাঁটি জায়গা ।

ন্যাশনাল মিউজিয়াম, ইয়াংগুন মায়ানমার এর সাংস্কৃতিক মন্ত্রণালয়ের অধীনে ডিপার্টমেন্ট অব কালচারাল ইন্সটিটিউট এর একটা প্রতিষ্ঠান । ১৯৯৬ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর এই মিউজিয়ামটা উদ্বোধন করা হয় । ৩.৮ একর এর মত এলাকা নিয়ে এই মিউজিয়ামটা প্রতিষ্ঠা করা হয় । এটা আশি ফিট উচ্চতা সম্পন্ন ও ৫ তলা মিউজিয়াম । মিয়ানমার এর কৃষ্টি ও সভ্যতা সেই প্রাচীন যুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত এতে সুন্দর ভাবে সাজানো আছে । এর মধ্যে অনেক কর্মচারী কর্মরত । লিফ্ট এর ব্যবস্থা আছে বিভিন্ন ফ্লোরে যাওয়ার জন্য। ভামার গোত্রের লোকজন বেশী। বাকী গোত্রগুলোর প্রতিনিধি অল্প ও তারা বেশ টেনশনে থাকে দেখতে পেলাম । বেশ চুপ চাপ থাকে তারা । বিভিন্ন কক্ষগুলো ঘুরে ঘুরে দেখতে প্রচুর সময় প্রয়োজন । আমরা আস্তে আস্তে একদিক থেকে দেখা শুরু করলাম । যেটা বেশী আকর্ষনীয় সেখানে সময় বেশী দিলাম বাকীগুলো শুধু এক নজর দেখে পরবর্তী আকর্ষন এর দিকে অগ্রসর হলাম ।

মায়ানমারের বর্ণমালা ও ক্যালিগ্রাফির বিশাল প্রদর্শনী আছে এখানে । বিভিন্ন সময়ে বর্ণমালার রূপ কেমন ছিল তা প্রদর্শিত হয়েছে । এ ছাড়া খৃষ্ট পূর্ব ২০ শতক এর হাতে লিখা স্ক্রিপ্ট এখানে প্রদর্শিত রয়েছে । মাটির পাত্রের গায়ে খোদাই করা প্রথম থেকে নবম শতকের বর্ণমালাগুলোর একটা ডিসপ্লে এখানে আছে । আরেকটা শো রুম এর নাম লায়ন থ্রন শো রুম । এখানে প্রায় আট ধরনের সিংহাসনের নমুনা রাখা আছে । আসলে প্রায় ৯ ধরনের সিংহাসন ছিল ২টির আকৃতি অনেকটা কাছাকাছি । একটা সিংহাসন ডিসপ্লেতে আছে সোনালী রং এর। এটা প্রায় ১৮০ বৎসর পূর্বে ইয়ামেনী কাঠের দ্বারা নির্মিত এবং পরে সোনা দিয়ে বাঁধাই করা হয়েছে । ব্রিটিশরা এটা ১৯০২ সালে কলকাতায় নিয়ে গিয়েছিল পরে ১৯৪৮ সালে মিয়ানমারের স্বাধীনতা লাভের পর এটা পুনরায়

ফেরত দিয়ে দেয় মিয়ানমারে । অন্যান্য সিংহাসনগুলো দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সময় আগুন লেগে ধ্বংস হয়ে গেছে । মিউজিয়ামটা সকাল দশটা থেকে বিকাশ চারটা পর্যন্ত খোলা থাকে এটাতে প্রবেশ মূল্য হলো দশ চ্যাট ছোটদের জন্য পাঁচ চ্যাট । বিদেশীদের জন্য প্রবেশ মূল্য পাঁচ ডলার । এর প্রথম তলায় ইয়াদানারন সময়কার শো রুম, লায়ন থর্ণ শো রুম ও ক্যালিগ্রাফির শোরুম আছে । দ্বিতীয় তলাতে মায়ানমার হিষ্টোরিক পিরিয়ড শো রুম, ন্যাচারাল হিষ্টোরী শো রুম ও প্রি হিসটোরিক পিরিয়ড শো রুম রয়েছে । তৃতীয় তালাতে ফোক আর্ট শো রুম ও পারফরমিং আর্ট শো রুম রয়েছে । মায়ানমার আর্ট গ্যালারী ও অর্নামেন্ট গ্যালারী রয়েছে চতুর্থ তলাতে সব শেষে পঞ্চম তলাতে মায়ানমারের বিভিন্ন জাতি সত্ত্বার সাংস্কৃতির শো রুম ও গৌতম বুদ্ধের বিভিন্ন ইমেজ এর শো রুম স্থান পেয়েছে ।

মায়ানমার হিষ্টোরিক পিরিয়ড শো রুমে ব্রোঞ্জ, পাথর ও টেরিকোটার উপর বিভিন্ন ধরনের মূর্তির বেশ সমৃদ্ধ সংগ্রহ রয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের ম্যুরাল পেইন্টিং এর কপি, কাঠের মূর্তি ও তালপাতার পুথি এখানে সাজানো আছে । বাগান এর প্যাগোড়ার ছবি ও অন্যান্য চিত্রকর্মও এখানে স্থান লাভ করেছে । মায়ানমার এর প্রাচীন অলংকার এর শো রুমে ফু, ইনওয়া ও ইয়াদানারন সময়কার মহিলাদের পরিধানের বিভিন্ন ধরনের অলংকার স্থান পেয়েছে । বৈচিত্রপূর্ণ শো রুম হলো বিভিন্ন জাতি সত্তার সাংস্কৃতিক সম্ভার এর শো রুমটিতে। এখানে মডেলের মাধ্যমে বিভিন্ন জাতির অবস্থান তাদের পোশাক/ পরিচ্ছদ, গান বাজনার যন্ত্রপাতি, হাতিয়ার সাংস্কৃতির অন্যান্য উপকরণ নিখুঁত ভাবে দেখানো হয়েছে । মায়ানমার ৭টা প্রদেশ ও ৭টা ডিভিশনের একটা একত্রীভুত ইউনিয়ন এর মধ্যে ভামার গোত্র সংখ্যাগরিষ্ট এবং তারাই দেশটাকে চালাচ্ছে । বাকীরা অনেকেই নির্যাতিত । অনেক জায়গায় জাতিগত সহিংসতা ও স্বাধীনতার/স্বায়ত্ব শাসনের জন্য আন্দোলন চলছে । এই মিউজিয়াম ঘুরে ঘুরে দেখতে কয়েক ঘন্টা চলে গেল শেষে দ্রুত অন্যান্য জায়গা দেখার জন্য বের হয়ে এলাম ।

বাগো শহর দেখতে আমরা সকালে রওয়ানা হলাম । প্রায় এক ঘন্টা লাগল শহরে পৌছাতে । ইয়াংগুন থেকে বের হয়ে ইয়াংগুন মান্দালে হাইওয়ে ধরে বাগো যেতে হয় । রাস্তার দু পাশে ধু ধু অনাবাদি ক্ষেত ।

শোয়েমাওডাও প্যাগোডা, বাগো

কোন গ্রামের নিশানাও দেখা যায় না । দুপাশের দিগন্ত বহুদুরে । খালি মনে হচ্ছিল এই জমিতে যদি চাষ করা যেত তাহলে আমাদের দেশে আর ফসলের অভাব হতো না । মায়ানমার কর্তৃপক্ষ এধরনের চাষের পক্ষে না বলেই মনে হলো । এক সময় পৃথিবীর অন্যতম প্রধান চাল উৎপাদন ও রপ্তানীকারক দেশ ছিল এই মায়ানমার । রাস্তাগুলো প্রশস্ত গাড়ী চলাচল অত্যন্ত কম । এক প্রদেশ থেকে অন্য প্রদেশে ভ্রমন করতে অনুমতি লাগে । সব কিছু মনে হলো স্থবির ও থমথমে । বাগোতে আমরা শোয়েমাওডাও প্যাগোডার সামনে এলাম । প্যাগোডার সামনে দোকান পাট । এখানে দোকানীরা বিভিন্ন ধরনের স্যুভেনির বিক্রি করছে । সাধারন মানুষজন, আরো সাধারন তাদের জীবন যাত্রা । মা দোকান করছে, হাতের কাজ করছে ও বাচ্চা সামলাচ্ছে । বাচ্চা কাঁদলে তাকে স্তন দিয়ে মুখ বন্ধ করছে । সরল নির্মল জীবন, চাওয়া পাওয়া অতি সামান্য । ছোট্ট পাত্রে খাবার রাঁধছে খাবে বলে । দোকান গুলোতে অনেক কাঠের তৈরী সামগ্রী পাওয়া যায় । কাঠ দিয়ে বিভিন্ন মূর্তি ও অন্যান্য আসবাবপত্র এখানে তৈরী হয় । পর্যটকরা এখান থেকে তা কিনে নেয় । বেশ অনেক দোকান আছে প্যাগোডাতে ঢোকার আগে । আমি কয়েকটা কাপড়ের তৈরী দেয়ালের পোষ্টার, হাতপাখা ও বার্মিজ বাদ্যযন্ত্র কিনলাম । দাম মোটামুটি বেশ ভালই । আমাদের দেখে দোকানীরা তাদের বিভিন্ন জিনিষপত্র দেখালো । সকাল বেলা কেবল তারা দোকান খুলছে । আমাদের দেখে তারা খুশী ।

ইতিহাস বলে গৌতমবুদ্ধ তার জীবদশায় দুইজন পবিত্র উত্তরসুরী নির্বাচন করেছিল তারা দুই ভাই নাম, মহাশালা ও কুল্লাশালা । তিনি এ দুজনকে বাগোতে নিয়ে এসে সুদাশনা পাহাড়ে একটা প্যাগোডা নির্মান করে তাদেরকে সেখানে প্রতিষ্ঠিত করেন । প্রথমে প্যাগোডার চূড়া ৭৫ ফিট উচু ছিল

পরবর্তীতে ৮৪০ সালের দিকে রাজা উইমালা এর উচ্চতা বাড়িয়ে ৮৮ ফিট করেন পরবর্তীতে এটার উচ্চতা ২৭৭ ফিট করা হয় । ১৪৯২ সালের ঝড়ে এটা ভূমিতে পতিত হলে রাজা বোধাওপায়া এটাকে ২৯৭ ফিট উচু করে পূণঃ নির্মান করেন । ১৯১২ সালের প্রবল ভূমিকম্পে এই ছাতা সদৃশ গম্বুজ ভূমি স্পর্শ করে এবং পরবর্তীতে ১৯১৭ সালের ভূমিকম্পে এটা ধ্বংসাবশেষ এ পরিনত হয় । ১৯২০ সালে এই প্যাগোডা আবার পূণঃ নির্মান করা হয়। ১৯৫৪ সালের এপ্রিলে প্রধানমন্ত্রী ইউ নুর পৃষ্টপোষকতায় ও আর্থিক অনুদানে ভূমিকম্প রোধক করে প্যাগোডাটি নির্মান করা হয় এবং বর্তমানে এটার উচ্চতা প্রায় ৩৭৩ ফিট । এর নির্মান কৌশলে প্রাচীন কালের ছাতার মত করেই গম্বুজ বানানো হয়েছে। প্যাগোডাটা ঘুরে ঘুরে দেখলাম আশ পাশের অনেক এলাকা নিয়ে এর অবস্থান। সিড়ির ধাপ কেটে কেটে এক চাতাল তারপর আরো ধাপ অতিক্রম করে মূল ভবনে যেতে হয় । দুটো বিশাল সিংহমূর্তী প্রবেশ পথে দাড়িয়ে আছে ।

প্যাগোডা দেখে আমরা বাগোর আরেকটা বিখ্যাত বৌদ্ধ মূর্তি দেখতে গেলাম এটাকে শায়িত বৌদ্ধ মূর্তি বলা হয় এটা লম্বায় ১৮০ ফিট উচ্চতা ৫২ ফিট এর এক বিশাল শায়িত বৌদ্ধ মূর্তি শত শত বছর ধরে খোলা আকাশের নীচে রোদ ঝড় বৃষ্টিতে মূর্তিটা প্রায় ধ্বংস প্রাপ্ত হয়ে গিয়েছিল । এর সাথে মাটি ও ঝোপঝাড় মিলিয়ে এটাকে অনেকটা ছোট খাট টিলা মনে হতো । বাগোতে রেল লাইন তৈরীর সময় দুর্ঘটনাবশত এটা আবিষ্কৃত হয়। এক ভারতীয় ঠিকাদার ইট তৈরীর জন্য পাহাড় কাটতে গেলে মাটির বদলে ইট বেরিয়ে আসে এবং স্থানীয় লোকজন এটার কাজ থামিয়ে দেয় । পরবর্তীতে ১৮৮১ সালের দিকে এই পবিত্র মূর্তি উদ্ধার করে পূনরায় একে গৌরবের আসনে আসীন করা হয় । ক্যামেরার ছোট লেন্সে একবারে এটার ছবি আসে না । কয়েকটা ছবি তুললাম এর অংশের সাথে । বিশাল এলাকা জুড়ে এর অবস্থান । এর আশে পাশে আরো অন্যান্য মূর্তি আছে সেগুলো ঘুরে ঘুরে দেখলাম । ছবিও তোলা হলো কিছু । সময় কিভাবে যে কেটে গেল বুঝতে পারিনি । এবার ইয়াংগুনে ফেরার পালা । ইয়াংগুনে ফেরার পথে আমরা টাটমাদো জুতার কারখানা পরিদর্শনে গেলাম । এটা ইয়াংগুন থেকে ৩১ কিঃ মিঃ দুরে ইয়াংগুন বাগো হাইওয়ের জাইয়াতকেউইন গ্রামে অবস্থিত । ১৯৬০ সালে এটা প্রতিষ্ঠিত হয়ে এখন পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের জুতা তৈরী করছে । এটা হংকং ও মায়ানমার সরকারের মধ্যে এটা যৌথ মালিকানা প্রকল্প । বার্মিজ সেনাবাহিনী এর দায়িত্বে রয়েছে । এর যন্ত্রপাতিগুলো বিভিন্ন সময়ে সুইডেন, ইংল্যান্ড, জাপান, কোরিয়া, হংকং থেকে আনা হয়েছে । যুগের সাথে তাল মিলিয়ে আধুনিক প্রযুক্তি গ্রহন করে ১৯৯২ সালে আবার নুতন নুতন

মেশিন সংযোজন করা হয়েছে । প্রায় দুইশত দশটা বিভিন্ন ধরনের মেশিন এখানে আছে । এখানে বিভিন্ন ধরনের কম্বেট সু, সিভিল জুতা, জংগল বুট ও ঘোড়ার জিন এর জিনিষ বানানো হয় । সেনাবাহিনীর জন্য প্রস্তুতকৃত সামগ্রী প্যাক করে অর্ডন্যান্স ডেপোতে পাঠানো হয় । ফ্যাক্টরী থেকে বিভিন্ন ধরনের জুতাও বিক্রি করা হয় । এখানে উৎপাদিত গল্ফ সু বেশ উন্নত মানের ও টেকসই । এক জোড়া বিশ ডলার এ বিক্রি করা হয় । বেশ ভাল মানের । যুগের সাথে তাল মিলিয়ে উৎপাদন ও মান নিয়ন্ত্রন করা হয় বলে এর প্রডাক্টগুলো যুগোপযোগী, প্রায় ঘন্টা খানেক ধরে আমরা প্রায় পঁচানব্বই একর এর ফ্যাক্টরী বিল্ডিং এবং এর আশে পাশের এলাকা ঘুরে দেখলাম । মানুষগুলো বেশ বন্ধু ভাবাপন্ন এবং ভালই লাগল তাদের আতিথেয়তা । পরিদর্শন শেষে ইয়াংগুনের পথে ফিরে চললাম ।

বাংলাদেশ থেকেই শুনে এসেছিলাম যে ইয়াংগুনে আমাদের দেশের বংগ বাজারের মত একটা মার্কেট আছে । একে বগি মার্কেট বলা হয় । এর নাম আসলে বগিওকি অং সান মার্কেট । হরেক রকম জিনিষের বিশাল সমাহার এই বাজারে । বিশাল এলাকা নিয়ে এটার অবস্থান । এর পাশেই একটা ওভার ব্রিজ থেকে গোটা এলাকা দেখা যায় । এখানে মিয়ানমারে তৈরী জিনিষপত্রের পাশাপাশি চীনের ও কিছু কিছু জিনিষ পাওয়া যায় । তবে বিখ্যাত হলো মিয়ানমারের পাথরের গহনা । বিভিন্ন ধরনের পাথর ও নকল পাথরের গহনা এখানে রূপা দিয়ে বাধানো অলংকার হিসেবে বিক্রি হয় । যারা পাথর ব্যবহার এ অভ্যস্ত তারা এই পাথরের গয়নার বেশ সমঝদার । তবে পাথর চিনতে হয় ও দাম বেশ ভাল ভাবে যাচাই করতে হয় । মুলামুলি না করলে ঠকার সম্ভাবনা শতভাগ এবং বিভিন্ন দোকন যাচাই না করে কেনা বোকামী । প্রায় ঘন্টা তিনেক ঘুরে কিছু পাথরের গহনা কিনলাম, মহিলাদের জুতা কেনা হলো কয়েক জোড়া । জামা কাপড় তেমন উন্নত না । বাংলাদেশের গার্মেন্টস এর চেয়ে ভাল । কেনা কাটার পর নতুন নতুন আর কি জিনিষ পাওয়া যায় দেখতে বের হলাম । তেমন আর কিছুই নেই । এখানে ভাষা সমস্যা তেমন প্রকট না । ইশারা ইংগিতে কথা হয় । ক্যালকুলেটরে বারগেইন করা যায় । পরিবারের সবাই মিলে দোকানে বসে । স্বামী স্ত্রী ভাগাভাগি করে দোকান করে । দোকানী মুলত স্ত্রীরা, স্বামীরা চুপচাপ বসে থাকে । মহিলারা বেশ চট পটে ও ক্রেতাদেরকে আকর্ষণ করতে পারে, দোকান সামলানো, ঘরকন্না, বাচ্চা পালন সবই এরা একসাথে দোকানে বসে করছে । নতুন দেশ নতুন রীতি । আমাদের কাছে নতুন অভিজ্ঞতা । ইয়াংগুনে হঠাৎ করে শখ হলো সিনেমা হলে গিয়ে ছবি দেখব । ট্যাক্সি নিলাম একটা । ট্যাক্সি ড্রাইভার একটু একটু

ইংরেজী বুঝে । বলল, আমাদের ডিজিটাল হলে নিয়ে যাবে । তার সাথে আস্তে আস্তে ভাব জমাতে জমাতে চললাম । বললাম দেশের কি অবস্থা । জানলাম যে সে সেনাবাহিনীর শাসনে প্রচন্ড বিরক্ত ও ক্ষুদ্ধ । দেশের অর্থনীতি ভাল নেই, মানুষ সুখী না । আমরা তাকে একটু ঘুরিয়ে দেখাতে বললাম শহরটা, সে বিভিন্ন জায়গার পাশ দিয়ে গাড়ী চালিয়ে নিল । রাস্তায় ট্রাফিক জ্যাম বেশী নাই । ভবনগুলো সুন্দর ভাবে বানানো, দারিদ্র বোঝা যায় না তবে পথচারীদের দেখলে মনে হয় তারা অসুখী এবং অভাবী। আমাদেরকে একটা মার্কেট এলাকায় নিয়ে এলো । ট্যাক্সি ভাড়া দিলাম । রিজনেবল ভাড়া । সেখানে দেখি ভারতীয় ছবি 'তাল ' চলছে । অবাক হবার পালা । চার কি পাঁচ তলাতে সিনেমা হল লিফ্ট এ করে উঠলাম । সুন্দর ও অত্যাধুনিক ডিজিটাল সিনেমা হল । অনেকটা ছোট খাট অডিটোরিয়াম এর মত টিকেট আমাদের টাকায় ৫০ কি ১০০ টাকার মত অনেক লোকজন ছবি দেখতে আসে। বিশাল পর্দায় তাল শুরু হলো । ঐশ্বরিয়া রায় এর ছবি । সাউন্ড এফেক্ট চমৎকার প্রথমে ভেবেছিলাম শুরু দেখে চলে আসব এত ভাল লাগল যে পুরো ছবিটাই দেখলাম ছবির মাঝে বিরতীতে পপকর্ণ ও কোক খেলাম, ভিতরে ফেরীওয়ালারা এসে বিক্রি করে । রাতে আবার টেক্সি নিয়ে হোটেলে ফিরে এলাম । ফেরার পথে মোটামুটি সব কিছুই বন্ধ হয়ে গেছে দেখলাম । ইয়াংগুনে সন্ধ্যার পর হোটেলে আসলে একটু হাঁটতে বের হতাম আশপাশের এলাকায় । আশে পাশে অনেকগুলো হোটেল আছে । সেগুলোতে ক্লাব, বার, ডিসকো ইত্যাদি আছে । সব কিছুই পর্যটকদের জন্য। স্থানীয় অধিবাসীরা তেমন আসে না ।

রাতের বেলা হাঁটতে হাঁটতে একটা ছোট দোকানের সামনে চলে এলাম । দোকানী এক তরুনী পেছনের একটা পার্টিশানের ওপারে ওদের থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা । মেয়েটা মুসলিম, নাম জিজ্ঞাসা করায় জানতে পারলাম । রাজধানী শহরে মুসলিমরা থাকে তেমন কোন সমস্যা ছাড়া। তবে আরাকানে এরা বেশ অত্যাচারিত । এদের আদিবাস ছিল মালয়েশিয়াতে । বাবা কিংবা দাদা বিয়ে করে এখানে স্থায়ী ভাবে বসবাস করছে । কোন সমস্যা হয় কিনা জিজ্ঞাসা করায় বলল যে কোন সমস্যা নেই । তাদের দোকানে বার্মিজ আচার তেতুলের জুসের ক্যান,লুঙ্গি ইত্যাদি বিক্রি হয় । আমরাও বললাম মুসলিম, খুশী হলো । ১টা তেতুলের জুস কিনে খেলাম বেশ মজা । এটা বার্মার একটা বিখ্যাত পানীয় । দেশে নেয়ার জন্য আরো কয়েকটা কিনলাম । বেশ কিছু আচার কেনা হলো । মায়ানমারের বরই ও আমের আচার বাংলাদেশেও পাওয়া যায় । এই সময় দেখলাম যে এখানে লুঙ্গি ও বিক্রি হয় বাংলাদেশী টাকায় ৯৫ টাকা দিয়ে একটা লুঙ্গি কিনলাম । দোকানে কিছুক্ষণ গল্প

করলাম । জানতে পারলাম এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে স্থানীয় কমিশনার এর অনুমতি পত্র লাগে ও তা পুলিশ চেক করে । এই দোকানের আয় দিয়ে এদের সাধারন ভাবে জীবন চলে যায়। তেমন আহামরি জীবন না, সরল অনারম্বর জীবন নিয়েই এরা খুশী । মালয়েশিয়া যাবে কিনা বলায় বলল না এখানেই ভাল ।

মায়ানমারে আমাদের দিনগুলো শেষ হয়ে এসেছে । পরদিন সকাল বেলা নাস্তা সেরে ব্যাগ জমা দিলাম হোটেলের লবিতে, চেক আউট করে বাসে উঠে বসলাম । আবার সেই ইয়াংগুন এয়ারপোর্ট । আজকে আমরা ইয়াংগুন এয়ার ওয়েজ এর ইউ বি-২২৫ বিমানের ফ্লাইটে করে ব্যাংকক যাব । ডিপারচার লাউঞ্জ সাদা মাটা । প্লাষ্টিক এর চেয়ার, আমরা স্পেশাল এলাকায় বসলাম । পাসপোর্ট ও অন্যান্য কাগজপত্র ইমিগ্রেশন এর ফর্মালিটিজ শেষ করার জন্য নিয়ে গিয়েছে । সব কাজ শেষে বাসে করে বিমান এর কাছে এলাম । নতুন একটা এয়ার ওয়েজ, প্রথম বারের মত এই এয়ার লাইন্স এ । স্থানীয় সময় ৭-৩০ মিনিটে ইয়াংগুন থেকে ব্যাংককের ডং মুয়াং এয়ার পোর্টের উদ্দেশ্যে আমাদের বিমান উড়াল দিল । পেছনে ফেলে আসলাম বার্মায় আমাদের স্মৃতিময় কয়েকটা দিন ।